রাজনীতি-নির্ভর সংস্কৃতনাটক ও বাংলায় তার উত্তরাধিকার

অরুন্ধতী দাস

সংক্ষিপ্তসার :

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র রাজনৈতিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস'। নাটকটির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক বিশেষত্বগুলি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এই নিবন্ধে দেখান হয়েছে প্রাচীন এই নাট্যকীর্তির পদাঙ্ক অনুসরণে পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে বিশেষতঃ বাংলায় রাজনীতির ইতিহাসকে উপজীব্য ক'রে কিভাবে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে। বিংশ শতকের প্রথম দশকের নাটকগুলি এক্ষেত্রে বেশিরভাগই রচিত হয় পরাধীন ও বিচ্ছিন্নপ্রায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস রূপে। তবে জাতীয়তাবাদকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক সত্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বা বিকৃত। রবীন্দ্রোত্তরযুগেও রাজনৈতিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে অনেক নাটক রচিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই মূল উপজীব্য ইতিহাস থেকে সাহিত্যকীর্তিতে উন্নীত। তবে মুদ্রারাক্ষসে আমরা কূটনীতি ও কল্পনার যে যুক্তিগ্রাহ্যতা লক্ষ্য করি তার অন্তরালে কোনো রোমান্টিসিজম্ নেই, যদিও তা পরবর্তীকালের নাটকে যথার্থ যুগোপযোগী সাহিত্যকীর্তি রচনার পথ প্রদর্শক।

মূল শব্দ : রাজনৈতিক নাটক, ঐতিহাসিক নাট্যসাহিত্য, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, সাহিত্যকীর্তি, জাতির প্রতিফলন।

সুপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগে সামাজিক বিবর্তনের পথে রাজনীতিশাস্ত্র হল সর্বকালের এক বহুচর্চিত বিষয়। ধর্ম, অর্থ নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু যে মূলতঃ রাজনীতি শাস্ত্রকে ভিত্তি করেই তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে, তা সুনিশ্চিত হওয়া যায় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কৌটিল্য প্রমুখের রচনায়। ধর্ম, অর্থ ও রাজনীতিকে নির্ভর করে প্রাচীন ভারতে বহু স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়ে থাকলেও, নাট্যকার বিশাখদত্ত প্রণীত সপ্তমাঙ্কবিশিষ্ট 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র রাজনৈতিক নাটক। 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাত্' অথবা 'ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তম অন্যদ্ বা সজ্জনাশ্রয়ম্'—এই শাস্ত্রীয় বচনানুযায়ী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুখ্যতঃ নাটকের কাহিনী আবর্তিত হলেও, এই নাটকটি ইতিহাসমাত্র নয়। পরন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিক চরিত্র 'পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্ত'-কে কেন্দ্র করে নন্দবংশের সঙ্গে সংঘাতের কাহিনীর যে অবতারণা করেছেন নাট্যকার, তা নিঃসন্দেহে তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্য রচনাধারার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ধারায় প্রবাহিত একটি নাট্যকীর্তিধারা।

মুদ্রারাক্ষস নাটকের প্রধান কাহিনী—নন্দবংশের পতন ঘটিয়ে মৌর্য রাজা চন্দ্রগুপ্তের উত্থান সে বিষয়ে তাঁর প্রধান সহকারী হয়েছে কুটিলমতি মন্ত্রী কৌটিল্যের বুদ্ধিবল। প্রাথমিক দৃষ্টিতে মৌর্যসম্রাট 'চন্দ্রগুপ্ত' (যিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে ভারত ইতিহাসে খ্যাত) এবং 'কৌটিল্য' দুটি চরিত্রই ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও, ঘটনার পারম্পর্য অনুসরণে বোঝা যায় যে, নাট্যকার এই চরিত্র দুটিকে সামনে রেখে পিছনে অনেক

কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন, যারা নাট্যকাহিনীটির পরিপুষ্টি, গতি ও সমাপ্তির পথে প্রধান সহায়ক হয়েছে। যেমন, পার্বত্যরাজ পর্বতক, তৎপুত্র মলয়কেতু ও তাঁর বিচক্ষণ মন্ত্রী রাক্ষস এবং বিভিন্ন গুপ্তচর, দূত ইত্যাদি অন্যান্য চরিত্র। ঐতিহাসিক দিক থেকে এদের অস্তিত্বের কোনো সত্যতা নেই, তথাপি নাট্যাকারের সুনিপুণ লেখনীতে এরা সজীব; বিশেষতঃ চাণক্যের প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদ্‌রূপে কল্পিত 'রাক্ষস' চরিত্রটির চিত্রণে নাট্যকার যথেষ্ট সচেতন। এইদিক থেকে বিচার করলে, নন্দনের চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কাহিনীর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা যে পরবর্তী কাল্পনিককাহিনী, তা বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের ব্যাপ্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে দুর্লভ স্থানের অধিকারী হয়েছে।

এই নাটকের মধ্যে 'পার্থিবশ্চন্দ্রগুপ্তঃ' ও 'পার্থিবোৎবন্তিবর্মা' এই রকম পাঠভেদ দেখা যায়। চন্দ্রগুপ্ত বললে, মুরা-পুত্র ও কৌটিল্যের স্নেহভাজন মৌর্যচন্দ্রের কথাই গ্রাহ্য হয় ইতিহাসের দিক থেকে। কিন্তু, 'বন্তিবর্মা'-র ক্ষেত্রে তাঁকে কনৌজের মৌখরীরাজ অবন্তিবর্মা (খ্রিস্টিয় সপ্তম শতক) অথবা কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মা অথবা হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর শ্বশুর—অবন্তিবর্মা (আনুমানিক ষষ্ঠ শতক)—কার সঙ্গে যুক্ত করা যুক্তিগ্রাহ্য হবে, সে নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ হতে পারে। আবার, 'পার্থিবো দন্তিবর্মা' এই পাঠান্তরও উপলব্ধ হয়, যা যথেষ্ট সমস্যাজনক, কারণ দাক্ষিণাত্যে পল্লব, রাষ্ট্রকূট ও লাট—প্রত্যেক বংশেই একজন করে দন্তিবর্মা-র অস্তিত্বের কথা জানা যায়। যেহেতু নন্দরা ছিলেন শুদ্রা মাতার সন্তান এবং উপযুক্ত রাজাদের মধ্যে কেবল মৌর্য চন্দ্রগুপ্তই 'ম্লেচ্ছ' নিধন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে, তাই এখানে 'ম্লেচ্ছ' বলতে শূদ্র বর্ণের নন্দবংশকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং ম্লেচ্ছনিধনকারী বলতে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকেই যে নির্দেশ করা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহ। এবং এই নাটকে উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসংখ্য মতপার্থক্য থাকলেও, কাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নাটকের চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত রূপে স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত হবে। তাই বিশাখাদত্তের এই নাটকটি চতুর্থ শতকের কোনো এক সময়ে রচিত নাটক বলে স্বীকার করা যাবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এ পর্যন্ত যত নাট্যকীর্তি রচিত হয়েছিল, তা সে ভাসের, কালিদাসের, শ্রীহর্ষের বা ভবভূতির যারই রচনা হোক, তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো ইতিহাসবা পুরাণের আভাস থাকলেও, মূল উপজীব্য ছিল কোনো বিষয়ান্তর। বিশেষতঃ লৌকিক বা অলৌকিক প্রণয়কাহিনীই ছিল তৎকালীন নাট্যরচনার রসদ। কিন্তু গতানুগতিকতা ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি ও তৎসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা, বাদানুবাদ, কূটনৈতিক কৌশল—কেবল এটাকেই মূল উপজীব্য করে বিশাখদত্তের লেখা এই নাটক নাট্যাস্বাদনপ্রার্থী সহৃদয়ের কাছে ভিন্ন স্বাদের সন্ধান দিয়েছিল। নন্দদের উচ্ছেদ করে মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থাপন, উভয়পক্ষের চরম শত্রুতা, অসাধারণ প্রতিভাবান কূটনীতিবিদ্ চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের ঘনিষ্ঠতা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অদম্য স্পৃহা প্রতিপক্ষীয় মন্ত্রী রাক্ষসের প্রখর বুদ্ধিবল, চাণক্যের সঙ্গে রাক্ষসের বুদ্ধিযুদ্ধ, পারস্পরিক চক্রান্ত, কূটনৈতিক কৌশল এবং শেষতঃ রাক্ষসকে কূটনীতির জালে জড়িয়ে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্তেরই সঙ্গে মিলন—সম্পূর্ণ নাটকেই রাজনৈতিক ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, এখানে অস্ত্রবল নয়, বুদ্ধিবলই রাজ্যজয়ের একমাত্র অস্ত্র। পরস্পরকে শুধু বুদ্ধিকৌশলে এভাবে পরাজিত করার প্রয়াস প্রশংসনীয়। নাটকের অঙ্গীরস বীররস, তথাপি যুদ্ধ, রক্তপাত—এসবের লেশমাত্রনেই এই নাটকে। উপরন্তু এটি নায়িকাবিহীন তো বটেই, স্ত্রীচরিত্রও প্রায় বর্জিত (একমাত্র চন্দনদাসের স্ত্রী চরিত্র বাদে) এবং বিদূষকচরিত্র-হীন নাটকও বটে।

সমগ্র নাটকটি বিশ্লেষণ করলে, এর মধ্যে রাজনীতি তথা কূটনীতির বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে

পড়ে। যেমন—প্রস্তাবনা অংশে 'কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ' ইত্যাদি দ্বারা সূচনার পর 'ধন্যা কেয়ং' ইত্যাদি নান্দীশ্লোকেও কুটিলগামিনী গঙ্গার প্রসঙ্গ উল্লেখ কূটনীতিরই প্রতীক বলা চলে। গুপ্তচর নিয়োগ এই নাটকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একদিকে যেমন, জীবসিদ্ধি, নিপুণক, ভাগুরায়ণ প্রভৃতি গুপ্তচরের মাধ্যমে অসাধারণ ধুরন্ধর বিপ্র চাণক্য দেশের সার্বত্রিক জনমত জেনেছেন, তেমনি প্রয়োজনে ভেদনীতি প্রয়োগেও দ্বিধা করেন নি। তৃতীয়াঙ্কে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কপটকলহ দ্বারা ভেদ সৃষ্টি করে রাক্ষসের দৃষ্টিতে চাণক্যহীন চন্দ্রগুপ্তকে 'অসহায়' বলে দেখানোর বিষয়টি চাণক্যের কুটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক চাল ছাড়া কিছুই নয়। আবার অন্যদিকে, চরের মাধ্যমেই কুসুমপুরের বণিক চন্দনদাসের গৃহে রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রের গচ্ছিত থাকার ঘটনাও তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রতিপক্ষ অমাত্য রাক্ষসের চররূপে তাদের দায়িত্বপালন করেছে—আহিতুন্ডিক (প্রকৃত নাম বিরাধগুপ্ত), করভক, দৌবারিক, প্রমোদক প্রভৃতি গুপ্তচর। কখনও সাপুড়ের ছদ্মবেশে, কখনও বা স্তুতিগায়ক হিসাবে তারা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর অনুগামিদের বিভ্রান্ত করেছে।

রাজাকে গণিকাদের মাধ্যমে প্রলুব্ধ ক'রে দিকভ্রষ্ট করার ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকলেও, 'বিষকন্যা' দ্বারা রাজা পর্বতকের মৃত্যু একটি অভিনব ঘটনা। এটির ঐতিহাসিক সত্যতা নেই, তবু, নিঃসন্দেহে এই নাটকে চাণক্যের কূটনৈতিক কৌশলের শিকার হয়েছে পর্বতক চরিত্র।

শুধু চাণক্যের বুদ্ধিবল-ই নয়, প্রতিপক্ষ অমাত্য রাক্ষসের চরিত্রেও পদে পদে প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা। কৌমুদী মহোৎসব বন্ধ করা নিয়ে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের দ্বন্দ্বকালে স্তুতিগায়ক কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের গুণকীর্ত্তন দ্বারা উভয়ের দ্বন্দ্বকে আরও নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে রাক্ষস। রাক্ষসের ন্যায় সমবুদ্ধিবলসম্পন্ন প্রতিপক্ষ চরিত্রটি এই নাটকে না হাজির থাকলে, চাণক্যের বুদ্ধিবল ও কূটনৈতিক কৌশল নিঃসন্দেহে বড়ো বেশি একতরফা হয়ে যেত। উভয়ের কূটনৈতিক দ্বন্দ্বেই নাটকটির নাটকীয়তা পূর্ণতা পেয়েছে। ঘটনার ক্রমান্বয়ে নাটকটিকে যেন রহস্য রোমাঞ্চ কোনো গোয়েন্দা কাহিনী বলে মনে হয় মাঝে মাঝে। আবার, অন্যান্য চরিত্রগুলির পিছনেও আছে এই দুই প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদেরই প্রত্যক্ষ বুদ্ধিপ্রয়োগ। তবু, যুদ্ধ বা রক্তপাত নাট্যকারের অভীষ্ট নয়। স্বয়ং চাণক্যের মুখেই তাই উচ্চারিত হয়েছে—

"অথ তব বলমুখ্যান্ ঘাতয়েৎ সাপি পীড়া।
বনগজ ইব তস্মাত্ সোৎভ্যুপায়ৈর্বিনেয়ঃ।।" (৩/২৫)

আবার, কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে মিত্রতা স্থাপনও এ নাটকের একটি বিশেষ দিক। এখানে যেন নৈতিকতা বা চিত্তৌদার্যের কোনো স্থান নেই। রাজনৈতিক প্রয়োজনমতো মিত্রকে শত্রু ও শত্রুকে মিত্রতে পরিণত করতে চরিত্রগুলি দ্বিধা করেনি।

স্বহস্তাক্ষরে পত্র না লিখে নন্দদেরই পত্রলেখক শকটদাসের হস্তাক্ষরে পত্র রচনার মধ্যেও চাণক্যের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অসাধারণ মন্ত্রগুপ্তি সম্বন্ধে তাঁর গুপ্তচর সিদ্ধার্থক যথার্থই বলেছেন—

"বয়স্য! অতিমুদ্ধোৎসি ইদানীং ত্বং যদ্ অমাত্যরাক্ষসেনাপি অনবগাহিতপূর্বতম্ আর্য্যচাণ্যচরিতম্ অবগাহিতুমিচ্ছসি।" (ষষ্ঠ অঙ্ক)

রাজনীতির চিন্তা ছাড়া চাণক্যের মনে যেন কোন চিন্তাই নেই—"ন প্রয়োজনমন্তরা চাণক্যঃ স্বপ্নেৎপি চেষ্টতে।"

সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চতুবর্গের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় এই নাটকে। বিশেষ করে যথাকালে দানের

দ্বারা গুপ্তচরগণকে সন্তুষ্ট রাখা, বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগ দ্বারা তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা রাজনৈতিক কৌশলের পরিচায়ক। চাণক্যের কূটনৈতিক চালের সামনে স্বয়ং চন্দ্রগুপ্তকেও কখনও বা বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়—"অয়ে কথং সত্যমেব আর্যঃ কুপিতঃ।" বিপরীতমুখী রাজনৈতিক কৌশলের আদান-প্রদানে নাটকটি স্বভাবতই ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে সংস্কৃত নাট্যজগতে।

প্রাচীন এই নাট্যকীর্তির পদাঙ্ক অনুসরণে পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন ভাষাতেও রাজনীতির ইতিহাসকে উপজীব্য ক'রে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে। এপ্রসঙ্গে বাংলা সহিত্যে বিংশ শতকের প্রথম দশকটি বাংলায় ঐতিহাসিক নাট্যসাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলে স্বীকার করা যায়। এসময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ নাট্যকার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগ পেরিয়ে, ইংরেজদের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধের কাহিনীকে অবধি নিজ নিজ নাটকের মূল বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিংশ শতকের শুরুতে পরাধীন ও বিচ্ছিন্নপ্রায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার অনলস প্রচেষ্টা করেছেন নাট্যকারগণ। এপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী' ইত্যাদি, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি নাটক এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—'তারাবাঈ' (১৯০৩ খ্রিঃ), 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫ খ্রিঃ), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬ খ্রিঃ), 'নূরজাহান' (১৯০৮ খ্রিঃ), 'মেবার পতন' (১৯০৮ খ্রিঃ), 'সাজাহান' (১৯০৯ খ্রিঃ), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১ খ্রিঃ), 'সিংহলবিজয়' (১৯১৫ খ্রিঃ) ইত্যাদি নাটকের নাম উল্লেখ্য। এর মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত' ছাড়া সবকটি নাটকই মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক আদর্শ বিজয়ী বীরের চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন জাতি উদ্বুদ্ধ করাই ছিল নাট্যকারদের উদ্দেশ্য। তবে নাট্যকারগণ অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ অথবা দর্শকের ভাবাবেগকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রচ্ছন্ন অথবা বিকৃত করেছেন। যেমন, গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা ও ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য চরিত্র আদর্শের সুন্দর প্রতিমূর্তি হলেও, এতে ঐতিহাসিক সত্যতার অভাব রয়েছে। আবার, বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার ইচ্ছায় হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতি স্থাপনের আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিভিন্ন নাটকে। এপ্রসঙ্গে কর্ণসিংহ ও সাজাহানের মিত্রতা, মহাবত্ খাঁর প্রতি কল্যাণীর নিষ্ঠা, শম্ভুসিংহের সঙ্গে মুসলমান নারীর বিবাহ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষারই প্রয়াস। শ্রী অজিতকুমার ঘোষ তাই 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'-এ লিখেছেন—"তাহারা প্রেমে অপ্রতিম, শৌর্যে সীমাহীন, আবার ক্রোধে প্রচণ্ড, হিংসায় দুর্বার। তাহাদের উত্থান-পতন আমাদের হৃদয়ে মৃদু কম্পন্ন জাগায় না, সজোর আঘাতে ইহাতে দ্রুত কম্পন্ন সৃষ্টি করে। ...ঐতিহাসিক ভূমিকাগুলিতে মানব-চরিত্রের এক-একটি পূর্ণ ও চরমরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।" প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম, দুর্গাদাসের মহত্ত্ব, গোবিন্দসিংহের সুদৃঢ় সংকল্প, মহাবত্ খাঁর কর্তব্য পরায়ণতা, কাশিমের প্রভুভক্তি—মানজীবনের এক-একটি আদর্শকে অভ্রান্তভাবে রূপায়িত করেছে। আবার, বীররসে উদ্বুদ্ধ করতে আবেগঘন বাক্যপ্রয়োগও করেছেন নাট্যকার। যথা, সাজাহান নাটকে—"উঠুন, দলিত ভুজঙ্গমের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃতশালা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্তবিক্রমে গর্জে উঠুন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন, নিয়তির মতো কঠিন হৌন, হিংসার মত অন্ধ হৌন, শয়তানের মত ক্রূর হৌন" (১ম অঙ্ক/৭ম দৃশ্য)।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'সিরাজদ্দৌলা, 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'চণ্ড', 'সৎনাম', 'বাসর', 'অশোক'—ইত্যাদি নাটক ঐতিহাসিক কাহিনীর ভিত্তিতে সৃষ্ট।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের লেখা 'প্রতাপাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'আলমগীর', 'চাঁদবিবি' ইত্যাদি রচনারও উপজীব্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস।

এইভাবে বিংশশতকের প্রখ্যাত নাট্যকারদের পেরিয়ে অর্বাচীন কালে রবীন্দ্রোত্তর যুগেও রাজনৈতিক পটভূমিকায় নাট্যসাহিত্য রচনার প্রয়াস অব্যাহত। যথা—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিকপতাকা' (ছত্রপতি শিবাজীর কাহিনী), 'সিরাজদ্দৌলা', 'রাষ্ট্রবিপ্লব' (দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহানের অনুসরণে); মন্মথ রায়ের 'খনা' (জ্যোতিষাচার্য বরাহ ও তাঁর পুত্রবধূ খনার কাহিনী), 'অশোক', 'মীরকাশিম' ইত্যাদি; মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপু সুলতান', 'রানী ভবানী', 'রানী দুর্গাবতী', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিংহ'; নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বঙ্গো বর্গী', 'দেবলাদেবী'; হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'পলাশী'—এই সমস্ত নাটকই রাজনৈতিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত।

চতুর্থ শতাব্দীর মুদ্রারাক্ষসের সঙ্গে এদের সামগ্রিক তুলনায় বলা চলে যে, সর্বত্রই ঐতিহাসিক চরিত্র তথা ঐতিহাসিক ঘটনাকে নাটকের মূল উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেও নাট্যকারগণ আপন লেখনীর সৌকর্যে ঘটনাগুলিকে ইতিহাস থেকে সাহিত্যকীর্তিতে উন্নীত করেছেন। তবে, মুদ্রারাক্ষসে আমরা শুধুই দুই কূটনীতিবিদের বুদ্ধিবলের সাহায্যে পরস্পরকে জব্দ করার প্রয়াস দেখি, সেখানে একটি রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য ক'রে ও কিছু কল্পনারও আশ্রয় নিয়ে যতটা সম্ভব যুক্তিগ্রাহ্য নাট্যকীর্তি রূপে বিশাখদত্ত নাটকটি উপস্থাপিত করেছেন; কোন জাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক চেতনায় সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা এ নাটকের রচনার পিছনে ছিল না। অপর দিকে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিগত দুই শতকে পরাধীন অসহায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রধান হাতিয়ার রূপে যেন তাঁদের নিজ নিজ লেখনীকে ব্যবহার করেছেন এ যুগের নাট্যকাররা। তাই, ঐতিহাসিক বীরের বীরত্বের জয়গান যেন অত্যাচারিত পরাধীন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার সুর। তবে, কালের গতিতে ঐতিহাসিক নাটকের নায়ক চরিত্রগুলিও ক্রমশঃ যুগোপযোগী হয়েছে। নাট্যরচনার উদ্দেশ্য যাই হোক, কেন, সাহিত্যকীর্তি যেহেতু সমাজের প্রতিফলন, জাতির প্রতিফলন ও জাতিগত মননের প্রতিফলন—তাই সর্বকালেই সমান হৃদয়গ্রাহী হয়েছে রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত নাটকগুলি। গতানুগতিক রোম্যান্টিসিজম্ ছেড়ে ভিন্ন পথে হাঁটার যে পথ প্রথম দেখিয়েছেন বিশাখদত্ত, তার ভূমিকা ভারতীয় নাট্যসাহিত্য জগতে প্রকৃতই প্রশংসার দাবি রাখে।

গ্রন্থসূচী :

ঘোষ, অজিতকুমার। ১৩৬৮ ব.স. (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ)। বাংলা নাটকের ইতিহাস। কলিকাতা (বর্তমান কলকাতা); জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

দাস, করুণাসিন্ধু। ২০০৮ (প্রথম সংস্করণ)। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

বিশাখদত্ত। ২০১৬ (চতুর্থ সংস্করণ)। মুদ্রারাক্ষস (বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ)। সম্পাদক : সীতানাথ আচার্য শাস্ত্রী ও দেবকুমার দাস। কলকাতা : সদেশ।

লেখক পরিচিতি :

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা